

Available online at <http://www.ijims.com>

ISSN: 2348 – 0343

The crisis of livelihood and overcoming it in the tribes of Tripura : In the light of Hachuk Khurio and Longtorai

ত্রিপুরার জনজাতি গোষ্ঠীর জীবিকার সঙ্কট ও উত্তরণ : হাচুক খুরিঅ ও লংতরাই উপন্যাসের আলোকে

Prasanta Das

Gandacherra Gov. Degree College, Tripura , India

Abstract

Nature not only nurtures and grips us to her breast but helps us to grow up according to her own wish. In order to save our lives, we come to her influence again and again. This instance has been reflected nicely in the novels of Bimal Shinha's 'Longtorai' and Sudhanna Debbarma's 'Hachuk Khurio' where the novelists have shown us how the tribes are badly affected on the arrival of the Bengali refugees and how their peaceful lives are being disturbed. They have dealt with the social, political and economical sides of the tribes of Tripura. Sudhanna Debbarma is the actual narrator of the lives and livelihood of the clans. His Novel Hachuk Khurio has depicted how the calm lives of the clans are being disgraced but by the same time it has portrayed how the renaissance was hasten in the lives of the tribes on the arrival of the Bengali refugees. The novel Longtorai has described the main source of crisis in the lives of the tribes as their rejection of the jhum cultivation and the adaptation of the plain land cultivation in the scientific way. The novel has shown us two different pictures: one is the crisis in the livelihood and another is how to get rid of this crisis. In order to save their lives, they discarded the jhum cultivation and without having any scope of work anywhere they adopted the road repairing and brick-breaking work and became the daily labourer. Ultimately, the novelist has shown us how the clans using the benefits of science and technology were enabled to develop themselves and started to go ahead with the changing of time. The main motif of the present speaker is to highlight on the two mentioned novels by the two novelists.

Key Words: livelihood ,Novel Hachuk Khurio, tribes ,Tripura, Longtorai

Article

প্রকৃতি শুধু আমাদের সত্তা ও মজ্জার সাথে জড়িত থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি আমাদের পালন করে নিজের মত করে । অস্তিত্ব রক্ষার মৌল তাগিদে আমরা বারে বারে প্রকৃতির স্মরণাপন্ন হতে বাধ্য । প্রত্যেকেই আমরা প্রকৃতির সন্তান । প্রকৃতির অনুসঙ্গেই আমাদের জীবনাচরণ ও জীবিকা নির্ধারিত । জীবিকার সাথে জড়িয়ে থাকে সত্তার ও মজ্জার আত্মিক যোগসূত্র, যা অনেকাংশে প্রকৃতির মুখাপেক্ষী । নির্মিয়মান সত্তা যেখানে বার বার আশ্রয় খোঁজে প্রকৃতির নিকট ।

সুধস্বা দেবর্মার 'হাচুক খুরিঅ' ও বিমল সিনহার 'লংতরাই' ত্রিপুরার প্রকৃতি পালিত জনজাতি গোষ্ঠীর শিকর-সন্ধানী জীবনালেখ্য । উপন্যাস দু'টিতে ত্রিপুরার জনজাতি গোষ্ঠীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ত্রিমুখী টানাপোড়েন ব্যাঙ হয়েছে বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা সম্বলিত চিত্রকরের সূক্ষ তুলির টানে । জনজাতি গোষ্ঠীর জীবনের কথাকার হলেন সুধস্বা দেবর্মা(১৯১৮-১৯৯৯)। লেখক নিজেও ককবরক ভাষী মানুষ । তাঁর 'হাচুক খুরিঅ'(পাহাড়ের কোলে) ককবরক ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস । লেখক উপন্যাসটির প্রথম খণ্ড

লেখেন বিহারে রাজবন্দী থাকা অবস্থায় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে । জেলমুক্তির পর তিনি অন্য তিনটি খণ্ড লেখেন । উপন্যাসের কালপর্ব ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের অবসান থেকে ত্রিপুরার বর্তমান সময় পর্যন্ত ।

ত্রিপুরার রাজনীতি এবং জনশিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে সুধন্বা দেববর্মা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত । ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের সাহিত্যিক ফসল ‘হাচুক খুরিঅ’ উপন্যাস । গ্রন্থ সম্পাদক কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরীর মন্তব্য এই বিষয়ে উল্লেখ করার মত— “হাচুক খুরিঅ উপন্যাস জনশিক্ষা আন্দোলনের ফসল । শুধু ফসল বললে ভুল করা হবে, এক মহৎ আন্দোলনের ফসল । রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ ও জুম কৃষি থেকে সমতল কৃষিতে উত্তরণ, উপজাতি জীবনের এই দুই উত্তরণের সন্ধিক্ষেপে ‘হাচুক খুরিঅ’ উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ । ত্রিপুরার উপজাতি সমাজে ভাঙা-গড়ার কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে ‘হাচুক খুরিঅ’ উপন্যাসে । জুম নির্ভর একটা আদি সাম্যবাদী উপজাতীয় সমাজ ব্যবস্থা ভাঙছে এবং শ্রেণি বিভাজনের রঙ ফুটে বেরোচ্ছে তাঁর সারা শরীরে পুঁজিবাদের পর্ব প্রসব করার যন্ত্রণায়।”^১

‘হাচুক খুরিঅ’ উপন্যাস একদিকে ত্রিপুরার জনজাতি গোষ্ঠীর পুনর্জাগরণের ইঙ্গিতবাহী, অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু জনস্রোত কীভাবে প্রকৃতি লালিত ত্রিপুরার শান্ত জীবনে বয়ে এনেছিল অশান্তির বাতাবরণ, তার বাস্তব দলিল । উপন্যাসে জুম চাষকে বর্জন করে সমতলের কৃষিকে গ্রহণ করার যে মানসিক সংঘাত বর্ণিত, তা তাদের জীবিকার সঙ্কটের দিকনির্দেশক ।

নরেনের সাথে ভক্তমণির কথপোকথনে আদিবাসীদের সমতলের কৃষিকে গ্রহণ করার মজ্জাগত টানাপোরেন প্রত্যক্ষগোচর হয়— “জুমে আগের মতো আর ফসল ফলে না, লক্ষী এখন টিলা ছেড়ে সমতলে নেমে এসেছেন, এখন আর ক্ষেত না করলে পেট ভরে না । বুঝলে দাদু, আগের মতো ঘন জঙ্গলের টিলাও এখন মেলে না । তাই বাধ্য হয়েই জুম ছেড়ে ক্ষেতে নেমে আসতে হয়েছে ।”^২ এই ‘বাধ্য হয়ে’ কথার মধ্যেই সমতলের কৃষিকে গ্রহণ করার আত্মিক অসংযোগের ইঙ্গিত স্পষ্ট ।

জীবিকা হিসেবে কৃষিকাজে তারা আত্মনিয়োগ করলেও সংসার তাতে চলে না । বুধুরায়ের স্ত্রী পদ্মাবতীর কথায় সেই কথা উঠে আসে— “দাদনের টাকা নেওয়ার পর মহাজনের ঋণ শেষ হয় না । মাটিতে পুতে যে কিছু খাবো সে জায়গাও কম । দেহের পেটটা বড়ো তাতে ভরতে ফাটাফটি,”^৩ ফলে স্বাভাবিক ভাবে জীবিকা হিসেবে তাদের বিকল্প পথ গ্রহণ করতে হয়েছে । বাধ্য হয়ে নেমে আসতে হয়েছে সমতলে । নিজের মজ্জা ও ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে তার মিল না থাকায় সমতলের কৃষিকে আত্মিক সংযোগের সঙ্গে অনেকেই গ্রহণ করতে পারেনি । উপন্যাসে সবিতার ভাই ভারতচন্দ্রের ভবধুরে জীবনের পেছনে রয়েছে নতুন পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা ও জীবিকার সঙ্গে মজ্জাগত অভিযোজনের অভাব ।

জীবিকা শুধু মানুষকে বেঁচে থাকার অবলম্বনটুকু দেয় না, নির্মাণ করে তার চারিত্র্য-মনন-চিন্তা-চেতনা । উপন্যাসের নায়ক নরেন অপলক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছে আপন জনজাতি গোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার নানা সঙ্কট । নিজে শিক্ষিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্বের সঙ্কট মোচনের জন্য নিবেদিত প্রাণে নিজে ও অন্য সকলকে প্রেরণা জুগিয়েছে । অনুভব করতে পেরেছে নিজের মজ্জা ও ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে জীবিকার মিল কতটুকু? সেই প্রশ্নে দোলায়িত না হয়ে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজেদের পরিবর্তন করেই উন্নতির দৌরগোরায়ে পৌঁছানো যায় ।

বিমল সিনহার ‘লংতরাই’(১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসে জীবিকার সঙ্কট এবং তা থেকে উত্তরণের চিত্র স্পষ্ট । ত্রিপুরার লংতরাই পাহাড়ে বসবাসকারী রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠীর জীবনাচরণ উপন্যাসের উপজীব্য । লেখক নিজে এই জনজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও তাদের জীবন ও জীবিকা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, সংস্কার,

বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি বিষয়কে অপূর্ব শিল্পসংরাগে আন্তরিক সনুভূতির সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন ।

‘লংতরাই’ উপন্যাস লংতরাই পাহাড় ও সেই পাহাড়কে আঁকড়ে ধরে যারা বাঁচার রসদ খুঁজে পায়, সেই রিয়াং জনজাতিদের জীবনবেদ । অফুরন্ত প্রাণ শক্তি নিয়ে লংতরাইয়ের কোলে বসবাসকারী এই জনজাতি গোষ্ঠীর জীবন সংরাগ এই উপন্যাসে চিরভাস্বর । প্রকৃতির শাসন পালন করে নিজেদের সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত রিয়াংদের জীবন ও জীবিকায় নেমে আসা নানা সঙ্কট ও তা থেকে বেরিয়ে নতুন আলোকোজ্জ্বল জীবনের পথে পা বাড়ানোর ইঙ্গিত এখানে স্পষ্ট ।

উপন্যাসের শুরুতে লংতরাই পাহাড়ের স্নিগ্ধ বর্ণনা উপন্যাসের শৈল্পিক মাধুর্যকে চিহ্নিত করে— “লংতরাই পাহাড় উঁচু টিলার গায়ে বিস্তৃত জুম ক্ষেত । পাহাড়ের ঢালুতে সাদা কাপস ফুল বাতাসের ঢেউয়ে নাচে । কাপাস ক্ষেতের উপর ভাসছে তিল গাছের থোকা থোকা ফল । আর একেবারে নীচু হয়ে জুমের লাল, সবুজ, হলুদ রঙ ধরা মরিচ । কাপাসের সাদা ওড়নার নীচে পাহাড়ী জামা, বিচিত্র রংয়ের বাহার । টিলার মাঝখানে অরহড় গাছ, উঁচু ডালগুলি বাতাসে নড়ছে । কোথাও আবার চিনার, খাকলু, কুমড়া, লতা থরে থরে ।”^৪

জুম ক্ষেত রিয়াংদের জীবন ও জীবিকার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । এখানেই তাদের জীবনের ভাঙাগড়ার ইতিহাস রচিত হয় । নিজেদের আবেগ অনুভূতির সরল ও প্রাণোচ্ছল প্রকাশ ঘটে এখানে । নিজেদের মেলে ধরার যে আনন্দ তা এই জুম ক্ষেতে মূর্ত রূপ পায় । তাদের মনের আদান-প্রদান চলে এই জুম চাষকে কেন্দ্র করে । সাজেরুঙের উদ্দেশ্যে গাওয়া জরাকামুনির গানে প্রেমপূর্ণ আবেগানুভূতির সাথে স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে জুম ক্ষেতের প্রসঙ্গ—

“বুকতই হাপুংনি তক জা ফাইজাকখা
তকনারই চকবুইমা, বুকতই তুইবুংনি
আ, বা ফাইজাকখা বিষতং চালাই চালাই
নাইয় সে মুখচিনদা কইরেং মা”^৫
(কোন পাহাড়ের পাখি তুমি
লেজ নাচিয়ে কেনো তুমি এলে
কোন নদীর বাঁক হারা মাছ
কেনো তুমি অচিন জুমে এলে)

উপন্যাসের নায়ক জরাকামুনি ও তার প্রেমিকা সাজেরুঙের প্রেমোদ্যান এই জুম ক্ষেত । জরাকামুনির “কুলসুমের সুর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, ভেসে যায় দূরে । দুপুর রোদে, মূলি বাঁশের পাহাড়ের লুঙ্গায় জালি বেতের বনে মায়া বিস্তার করে এই সুর ।”^৬ যে সুরে তালে তালে নাচে সাজেরুঙের মন । জুমের বাতাসে উড়ে তার খোলা চুল ।

কিন্তু সমস্যা হল নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন সব সময় জুম চাষের মাধ্যমে হয়ে ওঠে না । ফলে নির্দিষ্ট সময় পাহাড় জুড়ে অভাব দেখা দেয় । উপন্যাসে লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে— “জ্যেষ্ঠ মাস । পাহাড় জুড়ে অভাব । জরাকামুনিরও ঘরের খোরাক শেষ । উঠানে ধান কোটার গাইল পরিত্যক্ত, শ্যাওলা ধরা । ঘরে ধান ফুরিয়ে যাওয়ার নিষ্ঠুর সংকেত ।”^৭

ক্রমে অভাব-অনটনে তাদের জীবনের সরলতা চলে যায় । বৈশাখ-জৈষ্ঠের খরায় আসে অভাব অনটন । “আতংক, দুর্ভিক্ষের সর্বগ্রাসী কবল থেকে মুক্তির যুদ্ধ শুরু হয়, নিঃশক্তি মানুষগুলুর । বনের লতা ঝুপ, কচুশাক, কাঁঠালবীচির উপর নির্ভর করে মানুষের বাঁচার সংগ্রাম শুরু হয় ।”^৮ অস্তিত্বের তাগিদে তারা জুমিয়া জীবন পরিত্যাগ করে জীবিকা হিসেবে বেছে নেয় রাস্তা মেরামতের কাজকে । কিন্তু তার মধ্যেও রয়েছে মর্জিমাফিক ছাটাইয়ের অনিশ্চয়তা ।

তাদের জীবনের ছন্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জুম চাষ । কিন্তু সরকারী নির্দেশে বন দখল, অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত, বিতারিত হয়ে তাদের জীবনের ছন্দের পতন ঘটে । তাদের জীবনের দগদিগন্ত জুড়ে আছে এই অরণ্য ও জুম চাষ । সেই জীবন থেকে যদি কেউ বন কেড়ে নেয় তখন সেই জীবন ধুসর রুক্ষ মরুভূমির মতো হাহাকার করে । ঠিক এমনটাই ঘটলো লংতরাইয়ের কোলে লালিত এই ভূমিপুত্রদের বন দপ্তরের নির্দেশে—“বন দপ্তর কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে লংতরাই পাহাড়ের শিখরে । বাজারে বাজারে তেল পিটিয়ে ফরমান জারী করে জুম কাটা নিষেধ । বাঁশ, ছন, কাটা নিষেধ । বনজ সম্পদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেয় একটা চিরকুট কাগজের মতো নোটিশ দিয়ে । নির্ধূর আইনের হাড়িকাঠে জবাই শুরু হলো লংতরাই পাহাড়ের অসহায় জুমিয়াদের ।”^৯

প্রকৃতির সাথে যাদের মজ্জার সম্পর্ক সেই প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা তাদের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারে না । বুড়ো সত্যরামকে তাই বলতে শোনা যায়—“জুম বন্ধ । ...গাছ মাটি থেকে উপড়িয়ে ফেললে বাঁচে না । তেমনি আমাদেরকেও যদি বন থেকে বের করে দেয়, আমরা বাঁচব না ।”^{১০} তাই এই অন্যায়ে বিরুদ্ধে তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় প্রতিবাদের সুর—“বনে আমাদের জন্ম । বন আমাদের দেবতা । বন আমাদের স্বর্গ নরক সব কিছুর । ...সেই বন থেকে আমাদের তাড়ানো চলবে না ।”^{১১}

ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে রিয়াংরা জুম চাষ করে । মহাজনের নিকট থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে সর্বস্ব খুঁয়াতে হয় তাদের । মহাজনরা নিজেদের সুবিধার্থে অবস্থার সুযোগে নির্মম সব শর্তে তাদের ঋণ দেয় । ফলে মহাজনের ঋণে জড়িয়ে জনজাতির সর্বশান্ত । তাছাড়া তাদের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত সরকারি অর্থের সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত । তাই তাদের জীবনে নেমে আসে হতাশার কালো ছায়া ।

‘লংতরাই’ উপন্যাসে জীবিকার সঙ্কট অর্থাৎ অস্তিত্বের সঙ্কটে বিপন্ন জনজাতিদের মানসিক টানাপোড়েন এবং তা থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত উপন্যাসে স্পষ্ট । জুম ছেড়ে সমতলের কৃষিকে গ্রহণ করার মানসিক টানাপোড়েন থাকলেও উপন্যাসের শেষে লেখক প্রগতির পথে পা বড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন । উপন্যাসের শেষে লেখক দেখিয়েছেন জনজাতির কীভাবে নিজেদের উন্নতির জন্য চাষের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং সমবায়ের কথা স্বীকার করে প্রগতির পথে এগিয়ে যায় । দুই বছর পর আসামের জঙ্গল থেকে ফিরে আসা জরকামুনির প্রতি হাসনাই রিয়াং-এর উক্তিতে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট—“সারা জীবন জুম করে আমরা বাঁচতে পারবো না । এ অসম্ভব ব্যাপার । তাছাড়া দিনকাল বদলে যাচ্ছে । এখন বাঁচতে গেলে নতুন কোনো বাঁচার পথ আমাদের খুঁজে নিতে হবে ।”^{১২} বাঁচার নতুন পথের সন্ধানের চিন্তা থেকেই তাদের মনের মধ্যে অঙ্কুরদগম ঘটে সুস্থ উন্নত জীবনবোধের । উপন্যাসের অন্তিমে সাজেরুঙের মনে উৎসারিত সেই সোনালী স্বপ্ন জীবনের পঙ্কিলতাকে ধোয়ে সচ্ছতার অমোঘ নির্যাসে অভিসিক্ত—“রঙিন সপ্নের ঘোরে বিভোর তখন সাজেরুঙ । চোখে যেন দীপ্ত হয়ে ভাসছে অনাগত ভবিষ্যতের ছবি । কোলের ছেলেটা তার এমনি করে বাঁশির ডাকে ছুটে যাবে । ইস্কুলের ময়দানে কচি হাত দু’টি আকাশের দিকে তুলে থাকবে, পাথর ফুড়ে কচি ঘাস যেন ওপার বিস্ময়ে সূর্যের দিকে তাকায় ।”^{১৩}

যে বনে তাদের জন্ম । যে বন তাদের দেবতা । তাদের স্বর্গ নরক সব কিছু । যে বনের পাখী, বনের জন্তু জানোয়ার, বনের পতঙ্গ, বনের পাতা গোটা সব তাদের পরিচিত । যে বনের সঙ্গে তাদের মজ্জার সম্পর্ক তা থেকে বিতারিত হয়ে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নতুন জীবন ও জীবিকাকে গ্রহণ করার সার্থক দলিল বিমল সিংহের 'লংতরাই' উপন্যাস ।

References

- ^১ পাহাড়ের কোলে, প্রথম খণ্ড,(বঙ্গানুবাদ কুমুদ কুণ্ড চৌধুরী) অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০০৪, পৃঃ ৯।
- ^২ ঐ, পৃঃ ৩১।
- ^৩ ঐ, পৃঃ ১৮।
- ^৪ লংতরাই, বিমল সিংহ, নব চন্দনা প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা, তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৮, পৃঃ ৮।
- ^৫ ঐ,পৃঃ ৯।
- ^৬ ঐ,পৃঃ ৭।
- ^৭ ঐ, পৃঃ ২১।
- ^৮ ঐ, পৃঃ ২১।
- ^৯ ঐ, পৃঃ ২১।
- ^{১০} ঐ, পৃঃ ৩০।
- ^{১১} ঐ, পৃঃ ৩১।
- ^{১২} ঐ, পৃঃ ৬৮।
- ^{১৩} ঐ, পৃঃ ৭১।
